

আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইসমাতুল আশিয়া, সাহাবায়ে কেরাম, তাকফীর, সুন্নাহ ও ইমামাত
রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

১০. ৫. ৫. জিহাদ পালনের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান পূর্বশর্ত

আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফার আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী বলেছেন: “মুসলিম শাসকের অধীনে- সে নেককার হোক আর পাপী-বদকার হোক- হজ্জ্ব এবং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কোনো কিছুই এ দুটোকে বাতিল বা ব্যাহত করতে পারে না।” এ থেকে আমরা দেখছি যে, জিহাদ পালনের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের বিদ্যমানতা, অনুমোদন ও নেতৃত্ব পূর্বশর্ত। এটি খারিজীগণের সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতাতের মৌলিক পার্থক্য। জিহাদকে ফরয আইন গণ্য করার কারণে খারিজীগণ বলেন যে, এর জন্য নির্দিষ্ট কারো অনুমতি বা নেতৃত্বের প্রয়োজন নেই। কয়েকজন মানুষ একত্রে কাউকে নেতা বানিয়ে জিহাদ করতে পারেন। এখানেও তারা কুরআন-হাদীসের সাধারণ বক্তব্য, উৎসাহ ও নির্দেশকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। আহলুস সুন্নাহ যে সকল দলীল পেশ করেছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(১) আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ

“রাষ্ট্রপ্রধান ঢাল, যাকে সামনে রেখে যুদ্ধ পরিচালিত হবে।”[1]

আমরা দেখেছি যে, হাদীস, ফিকহ ও আকীদার পরিভাষায় ‘ইমাম’ শব্দটি শুধু রাষ্ট্রপ্রধান অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এভাবে আমরা এ হাদীস থেকে কিতাল বা জিহাদের জন্য তিনটি শর্তের কথা জানতে পারছি: (১) রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা, (২) রাষ্ট্রপ্রধানের বিদ্যমানতা এবং (৩) রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্ব। কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক নির্দেশনা বিষয়টি নিশ্চিত করে। এখানে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(ক) মুসলিমগণ যতদিন অমুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের অংশ হিসেবে বসবাস করেছেন ততদিন আল্লাহ জিহাদের অনুমতি দেন নি। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যখন মুসলিমগণ পৃথক রাষ্ট্রীয় সত্তায় পরিণত হন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا

“যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।”[2]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে মুসলিমগণ কোনো যুদ্ধ পরিচালনা করেননি।

(গ) যুদ্ধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতির গুরুত্ব জানা যায় আবু বাসীর (রা)-এর ঘটনা থেকে। হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি চুক্তি ছিল মক্কা থেকে পলাতক মুসলিমদেরকে কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে হুদাইবিয়ার ময়দানেই আবু জানদাল (রা) নামক একজন নির্যাতিত মুসলিম শৃঙ্খলিত অবস্থায় মক্কা থেকে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শর্ত মোতাবেক তাঁকে মক্কাবাসীদের হাতে সমর্পণ করেন। উপস্থিত সাহাবীগণ এ বিষয়ে খুবই আবেগী হয়ে উঠেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। এরপর আরেক নির্যাতিত মুসলিম আবু বাসীর (রা) মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকেও ফিরিয়ে দেন। এক পর্যায়ে আবু বাসীর (রা), আবু জানদাল (রা) ও আরো অনেক নির্যাতিত মুসলিম মক্কা থেকে পালিয়ে সিরিয়ার পথে ‘ঈস’ নামক স্থানে সমবেত হন। মদীনা রাষ্ট্রের সাথে মক্কাবাসীদের সন্ধি থাকলেও এ নতুন জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের সন্ধি ছিল না; বরং তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। এ অবস্থায় তাঁরা সিরিয়াগামী কুরাইশ কাফিলাগুলোর উপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। মক্কাবাসীরা বুঝতে পারে যে, এদেরকে মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিক মেনে সন্ধিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত করাই তাদের জন্য নিরাপদ। তাদেরই অনুরোধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সন্ধিচুক্তির সংশ্লিষ্ট শর্তটি বাতিল করে তাঁদেরকে মদীনায়ে বসবাসের ব্যবস্থা করেন।[3]

এভাবে মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবু বাসীর ও তাঁর সাথীদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেন নি। এজন্য তাঁরা মদীনা রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করতে বাধ্য হন। এ থেকে আমরা দেখি যে, কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারীর জন্য সন্ধি, যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্ত মান্য করা ফরয।

(২) কুরআন ও হাদীসে বারংবার ‘উলুল আমর’ বা শাসকদের আনুগত্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[4] আর জিহাদ আনুগত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে আনুগত্যহীনতা মুসলিম জনপদকে গৃহযুদ্ধ বা পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত করতে পারে। যদি রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ও আনুগত্যের বাইরে জিহাদ করার সুযোগ থাকে তবে নাগরিকগণ একে অপরের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করবেন। কখনো একে অপরকে কাফির বলে, কখনো অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে পরস্পরে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এজন্য প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস হাফিয ইবন হাজার আসকালানী বলেন:

لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويكف أذى بعضهم عن بعض

“রাষ্ট্রপ্রধানকে ঢাল বলা হয়েছে তার কারণ তিনি মুসলিমদেরকে শত্রুর ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন এবং মুসলিমদেরকে পারস্পরিক ক্ষতি থেকেও রক্ষা করেন।”[5]

(৩) জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু প্রাণহানি নয়, বরং জিহাদের উদ্দেশ্য যথাসাধ্য কম প্রাণহানির মাধ্যমে সর্বোচ্চ বিজয় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। শত্রুর শক্তি ও দুর্বলতা বিষয়ক তথ্যাদি রাষ্ট্র প্রধান যেভাবে সংগ্রহ করতে পারেন অন্য কেউ তা পারে না। ফলে তার তত্ত্বাবধানে জিহাদ কাজিফত বিজয় ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। এজন্য প্রসিদ্ধ মালিকী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরাবী (৫৪৩ হি) বলেন:

أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ النَّاسَ بِالْجِهَادِ سَرَايَا مُتَفَرِّقَةً أَوْ مُجْتَمَعِينَ عَلَى الْأَمِيرِ، فَإِنْ خَرَجَتِ السَّرَايَا فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِ

الإمام؛ لِيَكُونَ مُتَحَسِّسًا إِلَيْهِمْ وَعَضُدًا مِنْ وَرَائِهِمْ ، وَرَبِّمَا احْتَاجُوا إِلَى دَرْئِهِ .

“(হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা গ্রহণ কর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে যাও অথবা একযোগে বেরিয়ে যাও[6] আয়াতে) মহান আল্লাহ মানুষদেরকে বিভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে অথবা আমীরের (শাসকের) নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে জিহাদে গমন করলে আমীরের (শাসকের) অনুমতি ছাড়া বের হবে না। কারণ শাসক মুজাহিদদের খোঁজখবর রাখবেন এবং তাদেরকে পিছন থেকে সহায়তা করবেন। মুজাহিদগণ অনেক সময় শাসকের প্রতিরক্ষার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন।”[7]

ইমাম কুরতুবী (৬৭১ হি) একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন:

ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لهم، عضداً من ورائهم، وربما احتاجوا إلى درئه.

“রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া কোনো বাহিনী যুদ্ধে বের হবে না। কারণ শাসক মুজাহিদদের খোঁজখবর রাখবেন এবং তাদেরকে পিছন থেকে সহায়তা করবেন। মুজাহিদগণ অনেক সময় শাসকের প্রতিরক্ষার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন।”[8]

প্রসিদ্ধ হাম্বলী ফকীহ ইবন কুদামা আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ (৬২০ হি) বলেন:

وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك

“জিহাদের বিষয়টি ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে অর্পিত এবং তার ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধান যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে তার আনুগত্য করা জনগণের জন্য জরুরী।”[9]

ইবন কুদামা আকীদা বিষয়ক “লুমআতুল ইতিকাদ’ নামক গ্রন্থে বলেন:

ونرى الحج والجهاد ماضياً مع طاعة كل إمام برأ كان أو فاجراً، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة

“হজ্জ ও জিহাদ চালু থাকবে প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যের সাথে; রাষ্ট্রপ্রধান নেককার হোক আর পাপাচারী হোক। তাদের পিছনে জুমুআর সালাত বৈধ।”[10]

এভাবে আমরা দেখছি যে, জিহাদের ঘোষণা, শুরু ও পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের। কোনো মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যদি প্রয়োজনের সময় জিহাদ বর্জন করেন তবে তিনি এ পাপের দায়ভার বহন করবেন। নাগরিকদের দায়িত্ব সরকারকে তার দায়িত্ব পালনের দাওয়াত দেওয়া, দায়িত্বহীনতার প্রতিবাদ করা। কিন্তু কোনো অবস্থায় নাগরিকগণ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে জিহাদ ঘোষণা বা পরিচালনা করতে পারেন না।

ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক জিহাদ ঘোষণা ও শুরু করার পরে যুদ্ধরত শত্রু রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করার ক্ষেত্রেও অধিকাংশ ফকীহ ইমামের অনুমতি শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে কোনো রাষ্ট্র বা জনপদে শত্রুসৈন্য প্রবেশ করলে বা তা দখল করলে দেশকে দখলদার মুক্ত করতে নারী-পুরুষ প্রত্যেক নাগরিকের জন্য জিহাদ করা ফরয হয়ে যায়। এরূপ যুদ্ধকে জিহাদুদ দিফা (جهاد الدفاع) বা ‘প্রতিরক্ষার জিহাদ’ বলা হয়। এক্ষেত্রে নাগরিকগণ রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধ করবেন। এ সময়ে পিতামাতা বা স্বামীর অনুমতি গ্রহণেরও আবশ্যিকতা থাকে না। এ প্রসঙ্গে ইবন কুদামা আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ হাম্বলী (৬২০ হি) রচিত ‘আল-মুকনি’ গ্রন্থের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় সমকালীন প্রসিদ্ধ সৌদী ফকীহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ উসাইমীন বলেন:

لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاية الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاً.

“রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতীত কোনো বাহিনীর জন্য জিহাদ বৈধ নয়, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন। কারণ কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান জিহাদ-কিতাল বিষয়ক নির্দেশগুলোর দায়ভার রাষ্ট্রপ্রধানদের উপরেই, সাধারণ মানুষেরা এ আদেশগুলো দ্বারা সম্বোধিত নয়। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের অনুসরণ করবেন। কাজেই রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতীত কারো জন্য জিহাদ বা আক্রমণ বৈধ নয়। তবে প্রতিরক্ষার যুদ্ধ হলে ভিন্ন কথা। যদি শত্রুগণ কোনো জনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করে এবং তারা ভয় পায় যে, রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করলে শত্রু তাদের ক্ষতি করবে তবে এক্ষেত্রে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করবেন। এরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা নিশ্চিত হয়ে যায়।”[11]

ফুটনোট

[1] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৮০ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু উকাতালু মিন ওয়ারায়িল ইমাম); মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭১ (কিতাবুল ইমারাহ, বাবুন ফিল ইমামি ইয়া আমরা..)

[2] সূরা (২২) হজ্জ, আয়াত ৩৯।

[3] বুখারী, আস-সহীহ ২/৯৭৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/৩১১-৩১২।

[4] এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলো দেখুন: ইসলামের নামে জাঙ্গিবাদ ১৭৮-১৮৮, ২২৩-২২৭।

[5] ইবন হাজার, ফাতহুল বারী ৬/১১৬।

[6] সূরা (৪) নিসা: ৭১ আয়াত।

- [7] ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন ২/৪১৪।
- [8] কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন ৫/২৭৫।
- [9] ইবন কুদামা, আল-মুগনী ১০/৩৬৮।
- [10] ইবন কুদামা, লুমআতুল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ৩০।
- [11] ইবন উসাইমীন, আশ-শারহুল মুমতি' আলা যাদিল মুসতানকী ৮/২২।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7220>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন